আবুল মনসুর আহমদের খোঁজে : বুদ্ধদেব বসুর সাথে তর্কের সূত্র ধরে

মোহাম্মদ আজম*

সারসংক্ষেপ : ১৯৪২ সালে বুদ্ধদেব বসু 'সাহিত্যে পাকিস্তান অসম্ভব' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পাকিস্তানবাদী সাহিত্য-আন্দোলনের পক্ষ থেকে আবুল মনসুর আহমদ ওই প্রবন্ধের জবাব লিখেছিলেন একই বছর 'সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য' নামে। বর্তমান প্রবন্ধে এ দুই সাহিত্য-ব্যক্তিত্বের দুই প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে প্রধানত আবুল মনসুর আহমদের মত ও মতাদর্শের পরিচয় দেয়া হয়েছে। তুলনামূলক স্বল্প-পরিচিত এই বিতর্কের পরিচয়মূলক বিবৃতি প্রদান এ প্রবন্ধের প্রাথমিক লক্ষ্য। দুই প্রবন্ধের সূত্র ধরে আসলে সামনে আনা হয়েছে গত প্রায় একশ বছরের সাংস্কৃতিক রাজনীতির আংশিক পটভূমি, যেখানে প্রভাবশালী চিন্তাপ্রবাহের সাপেক্ষে অবদমিত চিন্তাপ্রবাহ পাঠের প্রণালি-পদ্ধতি গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলাদেশে আবুল মনসুর আহমদ পাঠের কিছু সূত্র ও প্রবণতা চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে যে, বিচার ও বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর রচনার পাঠ আমাদের চিন্তার ইতিহাস ও সূত্র বুঝতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

১. প্রস্তাব

গত হয়েছেন এমন ব্যক্তি নিয়ে আমরা যখন আলাপ করি, তখন মোটা দাগে আলাপটা হয় তিনটি মাত্রার এক বা একাধিক মাত্রা নিয়ে। প্রথমটি হলো, আমার বা আমাদের সত্তার ধারাবাহিকতায় আমরা অতীতের কোনো কৃতী ব্যক্তির কৃতিত্বের খোঁজ-খবর নিই। তাঁকে আমরা আজকের দিনে আর জীবিত-প্রাসঙ্গিক হিসাবে পাই না; কিন্তু নিজেদের অতীতের নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর কাজের সুফল চিহ্নিত করতে পারি। ফলে আমরা কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা জানাই। এই শ্রদ্ধা জানানোর আরেকটি দিক আছে। অতীতের কৃতী ব্যক্তি, যিনি শুধু জীবের জীবন যাপন না করে প্রত্যক্ষত পরমের জীবন যাপন করেছেন, অর্থাৎ শুধু ব্যক্তির জীবনে নিজেকে বদ্ধ না রেখে 'অপরে'র জন্য কাজ করে সফল হয়েছেন, তাঁকে স্মরণের মধ্য দিয়ে বর্তমানে অনুরূপ জীবনযাপনকারী ব্যক্তিরাও উৎসাহিত হবেন। পরবর্তী সময়ে বা মৃত্যুর পরে তাঁদের সম্ভাব্য প্রাপ্তি বর্তমান কাজের জ্বালানি হিসাবে কাজ করবে। যে দেশে গুণীর কদর হয় না, সে দেশে গুণী জন্মে না — এ কথার একটা তাৎপর্য এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

দ্বিতীয় মাত্রা এরকম : অতীতের কৃতী ব্যক্তিকে আমরা পড়ি আসলে সময়ের চিহ্ন হিসেবে। তিনি স্থান-কালের বিশেষ বাস্তবতায় জন্মেছেন, কাজ করেছেন, এবং স্থান-কাল দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পাশাপাশি স্থান-কালকে নির্মাণও করেছেন। তাঁকে পড়া সে

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কারণেই তাঁর সময়কে পড়া, তাঁর সময়ের উৎপাদন-সম্পর্ক আর ক্ষমতা-সম্পর্ককে পড়া। সেই সূত্রে ওই ব্যক্তিকে পড়ার নামে আমরা আসলে জীবনের ধারাপ্রবাহ সম্পর্কে নির্বস্তুক কাঠামো পাই, যা বর্তমানকে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে কাজে লাগে। দুনিয়ার বিভিন্ন ধারার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির বড় অংশ এ কাজটাই করেছে।

যাকে আমরা বলতে চাই তৃতীয় মাত্রা, তা অন্য দুটি থেকে খানিকটা আলাদা। বিগত ব্যক্তি কাজ করে থাকতে পারেন এমন-সব এলাকায়, এমন-সব প্রশ্ন নিয়ে, যেগুলোর সুরাহা আজও হয়নি। যেগুলো আজকের দিনের তাজা প্রশ্ন আকারেই জায়মান আছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে অতীত-মাত্রার তুলনায় বর্তমান-মাত্রাই অধিকতর গুরুতর হয়ে উঠবে, আর বিগত হয়েও ওই ব্যক্তি হবেন বিতর্কের সপ্রাণ অংশ।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইতিহাসপাঠের যে তিনটি মাত্রা আমরা এখানে চিহ্নিত করলাম, সেগুলো পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়। আবুল মনসুর আহমদের খোঁজখবর নিতে গিয়ে স্বভাবতই ওই তিন মাত্রাই কম-বেশি উঠে আসবে। তবে আমরা বিশেষভাবে জোর দেব তৃতীয়টির ওপর। এমন কিছু প্রসঙ্গে জোরারোপ করতে চাইব, যেগুলো আজকের বাংলাদেশ-পাঠের জন্য জরুরি থেকে গেছে। পাঠের জন্য আমরা বেছে নিয়েছি অপেক্ষাকৃত স্বল্প-পরিচিত একটা এলাকা — বুদ্ধদেব বসুর সাথে আবুল মনসুর আহমদের তর্ক। বুদ্ধদেব বসু পাকিস্তান-আন্দোলন জমে ওঠার প্রাক্কালে, বিশেষত পাকিস্তানবাদী সাহিত্য-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে, ১৯৪২ সালে লিখেছিলেন 'সাহিত্যে পাকিস্তান অসম্ভব' নামের প্রবন্ধ (বুদ্ধদেব, ২০০৭)। আবুল মনসুর আহমদ জবাব দিয়েছিলেন আলাদা প্রবন্ধ লিখে। প্রবন্ধের নাম : 'সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য' (আবুল মনসুর, ১৩৪৯)।

আবুল মনসুর আহমদ পড়ার জন্য এ তর্ককে বেছে নেয়ার অন্য এক কারণ আছে। তিনি সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁর ভাষা, সাহিত্য ও রাষ্ট্রতত্ত্বের বুনিয়াদ হিসেবে। *আবুল মনসুর আহমদ স্মারকগ্রন্থ* সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাঁর তত্ত্ব নিগৃহীত হয়েছে (ইমরান, ২০১৫)। অন্যদিকে বাংলা মুল্লুকে সংস্কৃতিচিন্তার যে ডিসকোর্স প্রায় একচ্ছত্র প্রতাপে রাজত্ব করছে, বুদ্ধদেব বসু তার অন্যতম প্রধান আইকন। এ দুজনের তর্কের পর্যালোচনা তাই এক অবদমিত সংস্কৃতিচিন্তার সাথে কর্তৃত্বকারী সংস্কৃতিচিন্তার তুলনামূলক পাঠ হিসাবেও গণ্য হতে পারে।

২. বুদ্ধদেব বসুর মত ও সিদ্ধান্ত

বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রবন্ধটি লিখেছেন প্রতিবাদ হিসেবে এবং এ প্রতিবাদ, তাঁর ভাষায়, 'সাহিত্যিক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে'। তিনি লক্ষ করেছেন, মুসলমান সাহিত্যিকরা বিশেষভাবে 'মুসলমান সাহিত্যিক'ই হতে চাচ্ছেন, শুধু সাহিত্যিক বা বাঙালি সাহিত্যিক নন। তুলনা হিসেবে বলেছেন, বাঙালি নারী-লেখকরাও শুধু লেখক না হয়ে 'মহিলা-লেখক' হতে চায়। এতে কোটার একটা সুবিধা পাওয়া যায়। খুব সহজেই খ্যাতি হয়,

এবং তালিকায় নাম আসে। মুসলমান লেখকরাও মুসলমানদের পত্রিকায় দু-চারটা লেখা ছেপে, মুসলমান পাঠক-শ্রেণির অল্প-বিস্তর বাহবা পেয়ে নিজেদের লেখক ভাবতে শুরু করে। ফলে সাহিত্যের যে বড় গণ্ডি এবং বৃহত্তর প্রাপ্তি তার প্রস্তুতিও তারা নেয় না, দৌড়েও শামিল হয় না। এটা তাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর হচ্ছে।

বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, মুসলিম সাহিত্য বলে আসলে কিছু হতে পারে না, যেমন হতে পারে না হিন্দু সাহিত্য। যদি কেউ মনে করে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশেষভাবে 'হিন্দুগন্ধী', ফলে এর চর্চা মুসলমানদের 'ঘোরতর হিন্দু' করে তুলবে, তাহলে তার উচিত বাংলা ছেড়ে উর্দুতে লেখা — উর্দুতেই বিশুদ্ধ মুসলিম সংস্কৃতি পরিবেশন করা। কিন্তু, বসু মনে করেন, এরকম আত্মঘাতী চিন্তা আসলে অল্প কিছু মানুষের। অনেক তরুণ লেখক 'আজকাল' লিখছেন, যাঁরা প্রতিশ্রুতিশীল এবং ধর্মে মুসলমান। বিশেষত তাঁদের উদ্দেশেই তাঁর এ বক্তব্য। কারণ, এ মনোভাব আগে বাংলা সাহিত্যে ছিল না। বিশেষত, 'পঁচিশ বছর আগে নজরুল ইসলাম' এবং 'পনের বছর আগে জসীমউদ্‌দীন' যখন সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা মুসলমান কবি হিসেবে নয়, কাব্যগুণেই দেশবাসীর 'হৃদয়ের অভিনন্দন পেয়েছিলেন'। কিন্তু আজকাল 'নজরুল বা জসীমউদ্‌দীন মুসলমানিত্বের গণ্ডিটুকুর মধ্যেই হয়ত আটকে আছেন'। এ অবস্থায় বুদ্ধদেব বসু মুসলমান লেখকদের মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ করেছেন যে, 'সাহিত্যে পাকিস্তান অসম্ভব'। কারণ, রাজনীতিতে কোনো কৃত্রিম ব্যবস্থা কিছুকাল চালানো যেতে পারে, কিন্তু সাহিত্য চিরমুক্ত। সাহিত্যের ময়দান গণতান্ত্রিক, এবং 'সাহিত্যই মানব জীবনের একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে কোনো রকম ভেদবুদ্ধির স্থান নেই'। ফলে যিনি নতুন লিখতে আসবেন, তিনি সবার সমান হয়েই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবেন। যদি কামিয়াব না হন, তাঁকে ফিরে যেতে হবে। আর যাঁরা 'প্রবেশের অধিকার পাবেন তাঁরা লাভ করবেন প্রকৃত গৌরব', ... 'কোনো সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের কৃত্রিম স্বীকৃতি মাত্র নয়'।

মুসলমান লেখকদের বসু মনে করিয়ে দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্যের লেখক তার আদর্শ আজ দুনিয়ার কোনো সাহিত্যধারার চাইতে নিচুতে নয়। ওই আদর্শ মাথায় রেখেই মুসলমান লেখকদের প্রস্তুতি নেয়া উচিত, লক্ষ্যে পৌঁছানোর লড়াই করা উচিত। যদি তারা তা করতে পারে, যদি 'মুসলিম সাহিত্যের গণ্ডি ভেঙে ফেলে' 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আপন বলে' গ্রহণ করতে পারে, তাহলে তা-ই 'কালক্রমে হতে পারে হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রধান ভিত্তি'। বসুর কাছে এ প্রশ্ন অবান্তর যে, 'আপনারা কেন মুসলমান সমাজ নিয়ে বই লেখেন না?' কারণ, 'হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক মিলনের ক্ষেত্র এখন পর্যন্ত অত্যন্ত সংকীর্ণ', আর সৎ লেখকেরা অভিজ্ঞতার বাইরে কিছু লেখেন না। ফলে হিন্দু-সমাজ মুসলমান-সমাজ সম্পর্কে জানেন না; কিন্তু তাঁরা জানতে চান। এ কাজ করতে পারে প্রকৃত মুসলমান লেখকেরাই। তিনি সাহিত্যের উদার-মহান মিলনমেলায় মুসলমান লেখকদের সেই পরিচয় নিয়ে হাজির হওয়ার আহবান

জানিয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসু শুরু করেছিলেন ভারত-ভাগ প্রস্তাবে বিস্ময় প্রকাশ করে। বলেছেন, রাজনীতিক নন বলে এ ব্যাপারে 'বিমূঢ় মৌন'ই তাঁর একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু সাহিত্যিক বিভক্তির প্রস্তাবে, তাঁর মতে, তিনি চুপ থাকতে পারেননি। প্রবন্ধটি শেষ হয়েছে এই আকাঙ্ক্ষায় যে, সাহিত্যিক সত্যের আন্তরিক মেশামেশিতেই বিভেদের রাজনৈতিক কূটচাল পরাস্ত হতে পারে।

৩. আবুল মনসুর আহমদের জবাব

আবুল মনসুর আহমদ বুদ্ধদেব বসুর উত্থাপিত প্রসঙ্গগুলোর পর্যালোচনা করেছেন – এক-অর্থে সরাসরি জবাব দিয়েছেন — বেশ গুছিয়ে এবং তুলনামূলক দীর্ঘ পরিসরে। বাংলার নারী-লেখকদের প্রসঙ্গে তিনি বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন। বলেছেন, বাংলার নারী-লেখকদের মধ্যে প্রতিভাসম্পন্ন লেখক আছেন। ফলে নিজেদের তাঁরা আলাদা কোটাভুক্ত করে লেখক বনতে চান, এ দাবি ঠিক নয়। আবুল মনসুর আহমদের ধারণা, 'মেয়ে লেখকদের লেখিকা করিয়াছে বাংলা ব্যাকরণ, — মেয়েরা নিজেরা নয়'। যেমন, সরলা দেবী *ভারতী* পত্রিকার সম্পাদকই ছিলেন, সম্পাদিকা নন। এই ব্যাকরণদ্রোহিতার জন্য সরলা দেবীকে তাঁর সাহিত্যিক ভ্রাতাদের নিকট 'কম গাল খাইতে হয় নাই'।

মুসলমান লেখকদের সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু যে অভিযোগ এনেছেন, তাও আবুল মনসুর আহমদ খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি প্রথমেই প্রশ্ন তুলেছেন বসুর লেখার কারণ নিয়ে। বসু লিখেছিলেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর কোনো বক্তব্য নেই বলে ভারতভাগের প্রস্তাবে তিনি কিছু বলেননি। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যকে সাহিত্যে টেনে আনতে দেখেই তিনি কলম ধরেছেন। আবুল মনসুর ঠিক এ জায়গাতেই আপত্তি তুলেছেন। লিখেছেন : 'বুদ্ধদেববাবুর আধুনিক মন এবং উদার দৃষ্টিও তাঁকে এখানে ফাঁকি দিয়াছে। তিনি রাজনীতিক নন এ কথা ঠিক নয়। রাজনৈতিক চৈতন্য হইতেই তিনি এই প্রতিবাদ করিয়াছেন — সাহিত্যিক চৈতন্য হইতে নয়'। তার প্রমাণ এই যে, মুসলমান লেখকেরা স্বতন্ত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেছে অন্তত পঁচিশ বছর আগে। ''বাঙলার সংবাদপত্রে'র অর্থাৎ হিন্দু-সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়'' মুসলমান গুণ্ডাদের মতোই মুসলমান লেখকেরা স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসাবেই অভিহিত হয়ে থাকেন। অবস্থাটা কারও কাছেই কখনও আপত্তিকর মনে হয়নি। তাহলে আজ বুদ্ধদেব বসু হঠাৎ বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখছেন কেন? আবুল মনসুর আহমদের জবাব যেন তৈরিই ছিল : 'আজ মুসলমানদের তরফ হইতে রাজনৈতিক পাকিস্তানের দাবি উঠিয়াছে বলিয়া যেমন অখণ্ড ভারতের দাবি উঠিয়াছে, তেমনি বুদ্ধদেব বাবুরা অখণ্ড বাঙলা সাহিত্যের এই নিতান্ত রাজনৈতিক দাবি তুলিয়াছেন'।

ফলে আবুল মনসুরের দাবি হলো, রাজনৈতিক পাকিস্তান-দাবির বিরোধিতাই বুদ্ধদেব বসুর আসল কথা। সেটা ঢাকার জন্য তিনি 'মেয়ে সাহিত্যিকদের খামাখাহ এই বিতর্কে টানিয়া আনিয়াছেন'। বুদ্ধদেব বসুর এই 'রাজনৈতিক' অবস্থানের প্রশংসা করেছেন মনসুর। বসুর 'অরাজনৈতিক' শিল্পতত্ত্বের প্রতি শ্লেষমিশ্রিত ইশারা করে তিনি লিখেছেন, 'বুদ্ধদেব বাবু এই আর্টবাদীদের গণ্ডি হইতে' বেরিয়ে রাজনীতির গণ্ডিতে এসেছেন বলে তিনি 'আমাদের নমস্য'। কিন্তু রাজনীতিরও বিপদ আছে। সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠার বিপদ। অখণ্ড ভারতবাদীরা যেমন, আবুল মনসুরের মতে, সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন করছে, বুদ্ধদেবও তেমনি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে 'অখণ্ড বাংলা সাহিত্যের নামে' সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবেরই পরিচয় দিচ্ছেন। এখানে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন : 'রাজনীতিতে পাকিস্তান সম্ভব-অসম্ভব ও আবশ্যক-অনাবশ্যক দুই-ই হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে পাকিস্তান শুধু সম্ভব নয় — স্বাভাবিক এবং দরকারী'।[১]

আবুল মনসুর আহমদকে জবাবের জন্য বাইরের যুক্তি বেশি খুঁজতে হয়নি। বুদ্ধদেব বসুর লেখা থেকেই তিনি পর্যাপ্ত কার্যকর রসদ পেয়ে গেছেন। দুটি প্রসঙ্গ তিনি সবিস্তার উল্লেখ করেছেন, যেগুলোতে বসু 'নিজের সব কথা এক কোপে ... নিজেই কাটিয়া ফেলিয়াছেন'। একটি হলো, হিন্দুরা মুসলমানদের জীবন সম্পর্কে কিছু জানেন না, ফলে তাদের জীবন নিয়ে সাহিত্য-রচনা হিন্দু লেখকদের পক্ষে সম্ভব নয়। জবাবে মনসুর দুনিয়ার বিচিত্র উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, জাতি-ধর্ম-ভাষা ও সংস্কৃতির দুস্তর ফারাক সত্ত্বেও অন্যদের সম্পর্কে দুর্দান্ত সব কেতাব রচনার, সাহিত্যকর্ম সৃষ্টির এন্তার নজির পাওয়া যায়। সেখানে একত্রে বাস করেও, অভিন্ন-ভাষী হয়েও, নানা ধরনের মেলামেশা এবং লেনদেনের মধ্যে থেকেও হিন্দুরা যদি মুসলমানদের সম্পর্কে কিছুই না জানে, তাহলে এর জন্য কে দায়ী? মনসুর বলছেন, তিনি কাউকে দায়ী করতে চান না। নিজেদের সাহিত্য নিজেরাই লিখতে চান। বুদ্ধদেব বসুরও তা-ই চাওয়া — মুসলমানদের জীবন নিয়ে মুসলমানরাই লিখুক। তাহলে 'আপত্তি কিসে'?

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি এই : 'মুসলমান-সাহিত্যিক' — এই বিশেষণে বুদ্ধদেব বসুর আপত্তি। কিন্তু 'এ-নাম কি মুসলমান সাহিত্যিকরা নিজেরা লইয়াছেন?' মনসুর আগেই বলেছেন, এ নাম আসলে মুসলমানদের নিজেদের আবিষ্কার নয়। তিনি বসুর লেখা থেকে এক মোক্ষম অংশ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুও ওই নামকরণকারীদের দলের একজন : 'আজকের দিনের নজরুল ইসলাম বা জসীমউদ্‌দীন মুসলমানিত্বের গণ্ডির মধ্যেই হয়ত আটকে আছেন, ... তাদের সঙ্গে আমাদের – অর্থাৎ বাংলার লেখক সমাজের — যোগাযোগ ক্ষীণ, ভাব-বিনিময় নাম মাত্র।' বসু হয়ত বেখেয়ালে মনের কথাটা বলে ফেলেছিলেন। এ কথা যে তাঁর নিজের প্রবন্ধের দাবি ও আপত্তিকে নস্যাৎ করে দেয়, তা খেয়াল করেননি। মনসুর কিন্তু ঠিকই ধরেছেন, এই 'আমরা' আর 'তারা' ভাগ করে বসু শুধু 'সাহিত্যিক কদর্যতা ও শিষ্টাচারগত দারিদ্র্যের' পরিচয় দেননি, 'মুসলমান-সাহিত্যিক' নামকরণেও অন্য 'হিন্দু/ বাঙালি' লেখকদের সাথে নিজে শামিল হয়েছেন।

যেসব মুসলমান সাহিত্যিক 'হিন্দুগন্ধী' বাংলায় লিখতে চান না, তাদের জন্য বুদ্ধদেব বসুর যে-পরামর্শ — বাংলা ছেড়ে উর্দুতে লেখালেখি শুরু করা – আবুল মনসুর আহমদ তাকে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, মুসলমানরা সফলভাবে উর্দুর আক্রমণ রুখে দিয়ে মাতৃভাষা বাংলার দাবি প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলা ভাষাতেই তারা সাহিত্যচর্চা করতে চায়, বাংলা সাহিত্যেরই চর্চা করতে চায়। বাংলা সাহিত্যের ধারাক্রমের মধ্যে 'চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বঙ্কিম, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য হইতেই' তারা সাহিত্যিক প্রেরণা লাভ করেছেন। তাদের চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষারই বিকাশ ঘটবে, বাংলা সাহিত্যই সমৃদ্ধ হবে।

৪. আবুল মনসুর আহমদের মত ও মতাদর্শ

'সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য' প্রবন্ধটি এতটাই গুছানো আর কার্যকর যে, মনে হতেই পারে, এর ভিত্তিতে আবুল মনসুর আহমদের সাথে বুদ্ধদেব বসুর অবস্থানের কোনো তুলনামূলক আলোচনা সমীচীন হবে না। কারণ, এ প্রবন্ধ আবুল মনসুরের প্রতিনিধিত্ব করলেও বসুর প্রবন্ধটি তাঁর প্রতিনিধি-স্থানীয় রচনা নয়। তবু, দুই কারণে এই তর্কের সূত্র ধরে আলোচনা চলতে পারে। এক. আমাদের আলাপ মুখ্যত আবুল মনসুর আহমদকে নিয়ে, বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে নয়। দুই. সীমিত পরিসরে হলেও বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধে তাঁর সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক মতের প্রত্যক্ষ আর রাজনৈতিক মতের পরোক্ষ প্রতিফলন আছে; আর আবুল মনসুর আহমদের ক্ষেত্রে আছে তাঁর নিজের চিন্তার সামগ্রিক প্রতিফলন।

আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্যচিন্তা সমালোচকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। অথচ বহু লেখায় শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি বিরামহীন আলোচনা-পর্যালোচনা করে গেছেন। সম্ভবত 'স্বাতন্ত্র্যবাদী' আখ্যার মধ্যেই সবাই তাঁর সাহিত্যতাত্ত্বিক মত সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন — আরও বেশি মনোযোগের প্রয়োজন বোধ করেননি। বস্তুত, পরিমাণে তুলনামূলক কম হলেও, এবং নামত আলাদা করে না লিখলেও, আবুল মনসুর আহমদ বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সাহিত্যতাত্ত্বিক।[২] 'সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য' প্রবন্ধেও তার কিছু ইশারা আছে।

বুদ্ধদেব বসুকে 'আর্টবাদী' সাহিত্যিক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তিনি। রঙ্গ করে বলেছেন, রাজনৈতিক ব্যাপারে নাক গলিয়ে বসু ঠিক কাজটিই করেছেন – আর্টবাদীদের গণ্ডি থেকে নিজেকে 'স্বতন্ত্র' করার চেষ্টা করেছেন। বোঝা যায়, তিরিশি সাহিত্যতত্ত্বের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে মনসুর পুরোপুরি হুঁশিয়ার ছিলেন। তিনি জানেন, সাহিত্য মানবজীবন হতে বিচ্ছিন্ন 'হাওয়ায়ী জিনিস' নয়, রাজনীতিও মানবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন

নয়। ফলে 'সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত'। বাংলা সাহিত্যের সমকালীন প্রভাবশালী মতাদর্শে যে এ বাস্তবতা অস্বীকৃত হয়েছে, মনসুর তা বিশেষভাবে নির্দেশ করেছেন। বলেছেন, 'যৌন-ক্ষুধার চেয়ে মানুষের পেটের ক্ষুধা কম শক্তিশালী অনুভূতি নয়'। অথচ, ধরা যাক, বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে এ অনুভূতির স্বীকৃতি মেলেনি। ফলে প্রতিবাদী সাহিত্যকর্মের একাংশকে বাংলার প্রভাবশালী সাহিত্যিক সমাজ 'রাজনৈতিক আবর্জনা ও আর্ট-বিরোধী পার্থিব ব্যাপার' হিসেবেই গণ্য করে আসছেন। প্রভাবশালী বাংলা সাহিত্যধারার ব্যাপারে আবুল মনসুর আহমদের এক অভিযোগ রাজনৈতিক চেতনার অস্বীকৃতি; অন্য অভিযোগ বাস্তবতার অভাব। তাঁর মতে, বাংলার মাটির সঙ্গে এ সাহিত্যের প্রাণের যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে এ সাহিত্য 'সুদৃশ্য শ্বেতমর্মরের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' হয়েছে; 'বাঙলার কুটীরের প্রাণ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই'।

শেষ বিচারে আবুল মনসুর আহমদ অবশ্য 'সাহিত্যবাদী'। তিনি মনে করতেন, সাহিত্য জনজীবনের সর্বোত্তম অভিব্যক্তি, এবং ওই অভিব্যক্তি বিপুল মানুষের জীবনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। ১৯৪৪ সালের পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণে এ প্রসঙ্গে তিনি আইরিশ কবি ডব্লিউ. বি. ইয়েট্সের প্রসঙ্গ টেনেছিলেন (আবুল মনসুর, ১৯৯৫ : ১০৩)। তাঁর মতে, ইয়েট্স ইংরেজির প্রভাবমুক্ত কেল্টিক সংস্কৃতির বুনিয়াদে গড়া আইরিশ সাহিত্য সৃষ্টি করলে আইরিশ গণ-মন নিজেদের আবিষ্কার করতে পারল। ফলে দু-শ বছরেও যে স্বাধীনতা ধরা দেয়নি, মাত্র বিশ বছরেই ডি ভেলেরার তা সম্ভব করলেন। সাহিত্যবাদিতার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর বেজায় মিল। প্রমথ চৌধুরীর সাথেও কতকটা। পার্থক্যের মধ্যে এই, তিনি অধিকতর রাজনৈতিক, সে রাজনীতি জনলিপ্ত ও গণতান্ত্রিক, আর গণতান্ত্রিকতার অবলম্বন বাস্তবের ভাষা এবং সংস্কৃতি।

'সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য' প্রবন্ধটিতে ভাষা সম্পর্কে প্রত্যক্ষত অল্প কয়েকটি বাক্য আছে। তবে সে বাক্যগুলো প্রত্যয়ী এবং লেখকের পূর্বাপর অবস্থানের সাথে সংগতিপূর্ণ। তিনি গভীরভাবে 'বাংলাপন্থি'। মনে করেন, একমাত্র বাংলা ভাষার সাহায্যেই বাঙালি মুসলমান নিজেদের জীবন বিকশিত করতে পারে। বুদ্ধদেব বসুর বাংলা ছেড়ে উর্দু গ্রহণের প্রস্তাবে তিনি সংগত কারণেই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। কয়েক বছর পরে পাকিস্তান রাষ্ট্রে উর্দুর সাথে লড়াইয়ে তিনি একই কাণ্ডজ্ঞান আর তেজের সাথে লড়েছিলেন। কিন্তু এ প্রবন্ধে তিনি আরও লিখেছেন, [যে ভাষায় মুসলমানরা সাহিত্যচর্চা করবে] 'সেটা হইবে বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা – হিন্দুর মাতৃভাষা নয়'। তাঁর যুক্তি হলো, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির পাণ্ডিত্যের ধাক্কায় 'উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা' মাতৃভাষা ত্যাগ করেছে। মুসলমানেরা তাদের অনুকরণ করে 'মাতৃভাষার স্বকীয়তা নষ্ট করিবে না'। প্রবন্ধের অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন, 'আমাদের সাহিত্য

আমাদের ভাষাতেই হইবে'।[৩] ঠিক এখানেই তাঁর সবচেয়ে বড় প্রকল্প 'সংস্কৃতি' এসে উপস্থিত হয়। তিনি অবশ্য 'সংস্কৃতি' শব্দটি কম ব্যবহার করতেন। পছন্দ করতেন 'কালচার' বা 'কৃষ্টি'। তাঁর মতে, সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে পাকিস্তান 'কালচার্যাল অটনমী' ছাড়া কিছু নয়। এই 'কালচার্যাল অটনমী'তেই অনুভূতির তীব্রতা সম্ভব। দুনিয়ার বড় সাহিত্যিকরা 'নিজেদের ভাষায় নিজেদের কৃষ্টিকেই' রূপায়ণ করেছেন। সেটাই মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির একমাত্র পথ।

এ প্রবন্ধ অবলম্বনে আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্য, ভাষা ও সংস্কৃতিচিন্তার যে সংক্ষিপ্ত মূর্তি প্রণীত হলো, তার ভিত্তিতে যদি তাঁর চিন্তাপদ্ধতি সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাই, তাহলে সবার আগে আসবে বাস্তববাদিতার কথা। আদর্শ ঠিক করে নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কর্মপন্থা ঠিক করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যাক, ভাষা ও সাহিত্যের উঁচু মান সম্পর্কে তাঁর ধারণা হয়ত কলকাতাকেন্দ্রিক চর্চার অভিজ্ঞতা থেকেই তৈরি হয়েছে। তাঁর বহু উচ্চারণ থেকে একথা প্রমাণ করা যাবে[৪]। কিন্তু দুটি কাজ থেকে তিনি সবসময়েই বিরত থেকেছেন। প্রথমত, যেখান থেকে অভিজ্ঞতা হলো তাকে আদর্শ বা মান ধরে নিজের প্রস্তাবনা তৈরি করেননি। ধারণাটা নিয়েছেন মাত্র। দ্বিতীয়ত, লক্ষ্যটা সবসময়েই উন্মুক্ত রেখেছেন। অর্থাৎ জনগোষ্ঠীর কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে যা দাঁড়াবে, তাকে স্থির-নির্দিষ্ট করে দেননি। যতীন সরকার *জীবন-ক্ষুধা* উপন্যাসের এক চমৎকার পর্যালোচনায় এ প্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তা যথার্থ বলেই মনে হয় :

> আবুল মনসুর বস্তুবাদী জীবনদর্শনের অনুসারী নন, এমনকি অজ্ঞেয়বাদীও নন তিনি; আবার অধ্যাত্মবাদের প্রতিও তাঁর কোনো টান নেই। তাঁর জীবনদৃষ্টিকে আখ্যায়িত করা যায় 'প্র্যাগম্যাটিক' বলে। (যতীন, ২০১৫ : ৪০)

সমকালীন বাঙালি মুসলমানের দুটি ভাবুক দলের সাথে তুলনা করলেই আবুল মনসুর আহমদের চিন্তার ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যাবে। একটি শিখা গোষ্ঠী এবং অন্যটি পাকিস্তানবাদী ইসলামি চিন্তকগণ। প্রথম দল কলকাতার চর্চা ও অর্জনের নিরিখে মুসলমান সমাজের জন্য আদর্শ ঠিক করেছিল[৫]; আর দ্বিতীয় দলটি গেছে আরও পশ্চিমে — কোনো মূল ইসলামি আদর্শের প্রত্যাবর্তন চেয়েছিল এই পূর্ব বাংলায়। বর্তমান প্রসঙ্গে বলা যায়, বুদ্ধদেব বসু যেখানে ক্রমাগত দোহাই দিয়েছেন মহিমাময় এক সাহিত্যলোকের, সেখানে আবুল মনসুর আহমদ ইতিহাস, নিকট-ইতিহাস আর বাস্তবের প্রত্যক্ষতা থেকে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন[৬]।

আবুল মনসুরের চিন্তার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, দেখা যাচ্ছে, ভাবনার সামগ্রিকতা ও পারস্পরিকতা। সাহিত্য, রাজনীতি ও জীবনের মধ্যে তাঁকে কোনো জল-অচল দেয়াল তুলতে হয়নি। তিনি জীবনযাপনের শনাক্তযোগ্য অভিব্যক্তির নাম দিয়েছিলেন 'কালচার', এবং সে কালচারকে কার্যকর বর্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন (Sartori

2007 : 123)। সাহিত্য ও রাজনীতি তাঁর কাছে সেই কালচারের দুই ভিন্ন প্রকাশ। সাহিত্যকে তিনি অন্তত ঘোষণায় অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন শুধু এই অর্থে যে, সংস্কৃতির সাহিত্যিক মূর্তায়ন রাজনৈতিক গতিবিধিকে শক্তি ও গতি দান করতে পারে।

প্রাসঙ্গিক অন্য রচনার সাথে মিলিয়ে পড়লে আবুল মনসুর আহমদের রচনায় পাওয়া যাবে এক আশ্চর্য পূর্বাপর সংগতি। আনিসুজ্জামান রাজনীতিচিন্তা প্রসঙ্গে যেমন খেয়াল করেছেন : 'চল্লিশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত আবুল মনসুর আহমদের রাষ্ট্রচিন্তায় একটা পূর্বাপর সঙ্গতি আছে' (আনিসুজ্জামান, ২০১৫ : ১৯৩)। এই সামঞ্জস্য ও সংগতি আসলে তাঁর চিন্তার অন্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতেও পাওয়া যাবে। সংগতিটা এসেছে চিন্তার সামগ্রিকতা থেকে; তত্ত্বায়নের অন্তর্নিহিত কাঠামোর সবলতা থেকে। এর ফলে তাঁর সম্পর্কে অবশ্য চিন্তার বিবর্তনহীনতার অভিযোগ তোলা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে দেখলে এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি চিন্তাজগতে প্রবেশ করেছেন, অন্তত লিখিত আকারে চিন্তাগুলো প্রকাশ করা শুরু করেছেন পরিণত বয়সে। ১৯৪০-এর দশকের গোড়ায়। ওই যে বুদ্ধদেব বসুর উদ্দেশে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'এ-সব পাঠ-টাঠ করিয়া, বুঝিয়া-সুজিয়াই' তাঁরা কাজে নেমেছেন, তা তাঁর নিজের চিন্তাকাঠামোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 'সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য' প্রবন্ধে এই সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তাকাঠামোর সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ইশারা আছে।

৫. আবুল মনসুর আহমদের চিন্তাধারা সম্পর্কে ভিন্নমতের খতিয়ান

বাংলাদেশের মূলধারার জাতীয়তাবাদী ধারাবিবরণীতে বা ইতিহাসের মূলধারায় আবুল মনসুর আহমদ এক অপরিহার্য ব্যক্তি। সাহিত্যের একটি ধারায় তাঁর সিদ্ধি প্রশ্নাতীত এবং সম্ভবত বাংলাদেশে অদ্যাবধি অতুলনীয়। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনাদি দৈশিক-আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ-অধ্যয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টেক্সট হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব সংগত কারণেই যোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছে, যদিও সম্ভবত যথার্থ পরিসরে বিশ্লেষিত হয়নি। রাজনৈতিক কর্মী, নেতা ও তাত্ত্বিক হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাসের একটা দীর্ঘ পরিসরে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে। কৃষক-প্রজা পার্টি, আওয়ামী মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট – এই নিরিখে আমরা যে ইতিহাস নির্মাণ করি, সেখানে আবুল মনসুর আহমদ কেন্দ্রীয় তৎপরতায় চিহ্নিত। এমনকি ষাটের দশকে রাজনীতি থেকে অবসরে যাওয়ার পরেও বঙ্গবন্ধুর নানা রাজনৈতিক তৎপরতার তিনি ছিলেন উৎসাহী সমর্থক ও অতুলনীয় বিশ্লেষক। ফলে 'বিগত ব্যক্তি' হিসেবে তিনি শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখিত-বিবৃত হন। এ লেখার শুরুতে স্মরণ করার যে তিনটি ধারার কথা বলা হয়েছে, উল্লেখের এই ধরন তার প্রথমটির সাথে মিলবে। দ্বিতীয় ধারায় তাঁকে ফেলতে বেশিরভাগ বিশ্লেষকই হয়ত আপত্তি করবেন না। কিন্তু ওই ধারার চর্চাই আমাদের দেশে কম। মুশকিল হয় তৃতীয়

মাত্রা নিয়ে — যেসব প্রশ্ন বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরে খুব প্রাসঙ্গিক আর সক্রিয় আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদ পাঠ করা।

একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটা আবার বলা যাক। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'যেখানে আবুল মনসুর আহমদ স্বতন্ত্র' প্রবন্ধে আবুল মনসুর আহমদের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন, কিন্তু তাঁর চিন্তার কতগুলো দিক এড়িয়ে গেছেন। এক জায়গায় লিখেছেন :

> তাঁর কিছু কিছু ধারণা অবশ্যই বিতর্কমূলক। বিশেষ করে ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমার নিজের নৈকট্য তো নেই-ই, হিসাব করলে দেখব কোথাও কোথাও ব্যবধান আছে। আমার মতো অনেকেই বলেন এই একই কথা। ...
> কিন্তু আমরা খুব ভুল করব যদি আবুল মনসুর আহমদকে বুঝতে চাই তাঁর রাজনীতিকে বাদ দিয়ে। (সিরাজুল, ২০১৫ : ১৫)

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বিচারপদ্ধতি পরীক্ষা করলে আমরা দেখব, তিনি 'বিতর্কে' সম্পৃক্ত না হয়ে এড়াতে চেয়েছেন। তিনি সংশ্লিষ্ট চিন্তাকে নিয়েছেন 'মত' হিসাবে, আর মিলাতে চেয়েছেন নিজের মতের সাথে। তিনি যে বলেছেন, অন্য অনেকেরও একই মত, সে কথা সত্য। কিন্তু মতের এই কারবার-যে চিন্তার পর্যালোচনার পদ্ধতিগত দিকগুলোকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে, তা তিনি খেয়াল করেননি। এই স্পর্শকাতর দিকগুলো বাদ দিয়ে তিনি প্রবেশ করতে চেয়েছেন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ক্ষেত্রে। তাতে গা বাঁচিয়ে আবুল মনসুর আহমদের প্রশংসা করা গেছে। কিন্তু তৈরি হয়েছে আরেক পদ্ধতিগত জটিলতা। আবুল মনসুরের রাজনীতিকে আলাদা করতে হয়েছে তাঁর অন্য চিন্তা থেকে। আমরা আগেই দেখেছি, তাঁর ক্ষেত্রে এভাবে আলাদা করে পাঠ করা বিপজ্জনক। কারণ, তাঁর চিন্তার প্রধান লক্ষণই হলো সামগ্রিকতা। সে সমগ্রের প্রেক্ষাপট নির্মাণ না করে চিন্তার একাংশ পাঠ করা কেবল আংশিকতা-দোষে দুষ্ট হবে না, 'ভুল' বার্তা দেবে।

এখানে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর পাঠ-পদ্ধতি সম্পর্কে যা বলা হলো, তা আসলে আবুল মনসুরের অধিকাংশ পাঠকের ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবেই সত্য। অন্য অনেকেই হয়ত 'বিতর্কমূলক' ব্যাপারগুলোকে আরেকটু পরিচ্ছন্ন করে সামনে এনেছেন। কিন্তু সেগুলোকে দুর্বলতা বলেই এড়িয়ে গেছেন। তার মানেই হলো, মীমাংসিত বা প্রতিষ্ঠিত সত্য বা মত সামনে রেখে তাঁরা পড়েছেন। সেই সত্য বা মতের সাথে যেখানে মিলেছে সেখানে আবুল মনসুরের প্রশংসা করেছেন, যেখানে মেলেনি সেখানে এড়িয়ে গেছেন। বস্তুত এ প্রশ্ন কখনো উত্থাপিতই হয়নি, সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাজনীতি-সংগঠনে আবুল মনসুর আহমদের যদি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থেকেই থাকে, তাহলে যে চিন্তার ভিত্তিতে তিনি সে কর্মকাণ্ড সম্ভবপর করলেন, তা বিপরীতধর্মী হয় কীভাবে? যদি উঠত তাহলে দেখা যেত, জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের গালগল্পে সাদা-কালোয় বিভাজিত যে কোটা প্রতিষ্ঠিত হয়, তার বাইরের ধূসর এলাকা আসলে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ সেখানেই পর্যালোচনার সুযোগ বেশি; সে এলাকাটাই বর্তমানকে সজীব-সপ্রাণ

করতে পারে – পরস্পর-বৈপরীত্যে প্রতিষ্ঠিত 'মত' এ কাজ করতে পারে না।

আমরা এখানে 'সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য' প্রবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে এমন দুটি এলাকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করব।

'সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য' আবুল মনসুর আহমদের যাবতীয় চিন্তার মূল ভিত্তি। তাঁর প্রজন্মের এটাই মূলধারা, যদিও অন্যদের সাথে তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য ছিল (আনিসুজ্জামান, ২০১৫)। সম্ভবত পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কারণেই, পরবর্তীকালে ইতিহাসের ওই প্রেক্ষাপটের 'স্বাতন্ত্র্যবাদী' শব্দটি বিশুদ্ধ নেতিবাচক অর্থ পরিগ্রহ করে[৭]। শব্দটির সাথে আবশ্যিকভাবে যুক্ত হয়ে যায় 'মুসলমান' শব্দটি। উচ্চারিত হোক বা না হোক, 'স্বাতন্ত্র্যবাদী' কথাটায় 'মুসলমান স্বাতন্ত্র্যবাদী'ই বোঝাতে থাকে। কিন্তু আবুল মনসুর আহমদ প্রশ্ন তুলেছেন : 'স্বাতন্ত্র্য' কি মুসলমানদের আবিষ্কার? অধিকতর তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এখন নিশ্চিত করে বলা যায়, পুরো ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নতুনভাবে দেখা সম্ভব।

প্রথমত, হিন্দু-মুসলমান স্বাতন্ত্র্যচিন্তা প্রবলভাবে বিকশিত হয়েছিল উনিশ শতকের কলকাতায়। বস্তুত, কলকাতায় উনিশ শতকের এমন কোনো প্রভাবশালী বয়ান বা তৎপরতা পাওয়া যায় না, যা হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠীকে একত্রে সম্বোধন করেছে। এর সবচেয়ে পাঠযোগ্য ছবি পাওয়া যাবে সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক কিছু পর্যালোচনায় এ ব্যাপারটি কোনো রকম রাখঢাক না করেই বলা হয়েছে। সম্ভাব্য অসংখ্য উদাহরণ থেকে এখানে শুধু দুটির উল্লেখ করি। দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর *হ্যাবিটেশন অব মডার্নিটি* বইয়ের অন্তর্গত 'মেমরিজ অব ডিসপ্লেসমেন্ট : দ্য পোয়েট্রি অ্যান্ড প্রেজুডিস অব ডুয়েলিং' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন (Chakrabarty, 2002), বাঙালি ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ তাঁবে গড়ে-ওঠা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে 'ঘরের কথা' লেখা হলো, তাতে মুসলমান সমাজ পুরোপুরি বাদ পড়ল। 'বাদ পড়া' বলতে কী বোঝায়, দীপেশ চক্রবর্তী তার গভীর বিশ্লেষণ করেছেন। অন্য মন্তব্যটি নেয়া যাক সুদীপ্ত কবিরাজ থেকে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে সারগর্ভ দীর্ঘ নিবন্ধে সুদীপ্ত লিখেছেন :

> In the age of Rammohan Roy (1774–1833), cultivation of an upper-class Bengali included a mandatory initiation into Islamic culture and a fluent grasp of Persian. By the time of Rabindranath Tagore (1861–1941), roughly a century later, literary high culture had gone through a striking conversion to become a more solidly Hindu sphere. (Kaviraj, 2003 : 531)

এখানে উল্লেখ করা দরকার, সুদীপ্ত কবিরাজ যে ইসলামি সংস্কৃতির কথা বলেছেন বাংলা অঞ্চলের মুসলমানদের সাথে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকলেও বাংলার মুসলমান কৃষিজীবী সমাজের সংস্কৃতিকে এ নামে বোঝা যাবে না। মুশকিল হলো, কলকাতার

'আধুনিক' সাহিত্যে পুরনো অভিজাত ইসলামি সংস্কৃতি বাদ পড়ার সাথে সাথে মুসলমান সমাজের জনসংস্কৃতিও সম্পূর্ণ বাদ পড়েছিল। অথচ উপনিবেশ-পূর্ব বাংলার ভাষায়-সমাজে হিন্দু-মুসলমান মেলমিশের যথেষ্ট গভীর নজির পাওয়া যায়। সুদীপ্ত কবিরাজ তাঁর ওই নিবন্ধে সে মিশামিশিরও পরিচয় দিয়েছেন। সাথে সাথে এ-ও উল্লেখ করেছেন, বিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যখন বিধিবদ্ধ হচ্ছিল, যেমন, সুকুমার সেনের ক্লাসিক ইতিহাস-গ্রন্থে, তখন পুরানা ও নবীন সাহিত্যে মুসলমানি উপাদান হয় পুরোপুরি বাদ পড়ল, অথবা কেবল নাম-কা-ওয়াস্তে উল্লেখিত হলো। সুদীপ্ত এই বাস্তবতাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের গুরুতর সংকট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

দ্বিতীয়ত, ১৮৮০ সালের পর থেকে জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্সে 'সংস্কৃতি' একটি কার্যকর বর্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। পরবর্তী দশকগুলোতে বিশুদ্ধ উচ্চবর্ণ হিন্দু সাংস্কৃতিক বর্গের সাপেক্ষে গভীরভাবে ধারণাটি নির্মিত হয়। ফলে বিশ শতকের গোড়ার দশকগুলোতে মুসলমানরা যখন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ময়দানে সক্রিয় হতে শুরু করে, তখন স্বতন্ত্র সংস্কৃতির একটি ধারণা তৈরিই ছিল। মুসলমান জনগোষ্ঠী সে ধারণায় অংশ নিয়েছে মাত্র। সাটোরি যেমনটা বলেছেন :

> By positing Bengali Muslims as a *cultural* nation, Ahmad was contesting the characterization of Muslims as a sub-national interest-group. In this sense, he was drawing directly from what we might call the 'great tradition' of Hindu nationalism in Bengal. (Sartori, 2007 : 127)

বস্তুত এই ভাষা এবং কর্মপদ্ধতি — সম্প্রদায়ের সীমানার মধ্যে কাজ করা — এত প্রবল ছিল যে, একে এড়ানোর কোনো উপায়ই ছিল না। স্মরণ করা যেতে পারে, *শিখা* গোষ্ঠীর এতটা মানবতাবাদী, এতটা অসাম্প্রদায়িক, এতটা সমন্বয়বাদী তরুণদেরও কাজ করতে হয়েছিল সম্প্রদায়ভিত্তিক নাম নিয়ে।

তৃতীয়ত, বিশের দশকের জটিল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উচ্চশ্রেণির বাঙালি-হিন্দু-সংস্কৃতি কেবল স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসীই থাকেনি, বিরোধমূলক অবস্থানও নিয়েছে। জয়া চ্যাটার্জী (২০০৩) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থপরিসরে এই বিরোধের নির্ভরযোগ্য পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার, এই বিরোধের ভিত্তি ছিল সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য। জয়া চ্যাটার্জী সাংস্কৃতিক বিরোধের উদাহরণ হিসেবে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নজির টেনেছেন, যিনি নিজে ওই সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ নির্মাতা। 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' (১৩৩৩) প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের মিল না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে শরৎচন্দ্র লিখেছেন :

> কিন্তু, কেন এরূপ হয়? ইহা কি কেবল শুধু অশিক্ষারই ফল? শিক্ষা মানে যদি লেখাপড়া জানা হয়, তাহা হইলে চাষী-মজুরের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানে বেশী তারতম্য নাই। কিন্তু শিক্ষার তাৎপর্য যদি অন্তরের প্রসার ও হৃদয়ের কাল্‌চার হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে উভয় সম্প্রদায়ের তুলনাই হয় না।...

> মিলন হয় সমানে সমানে। শিক্ষা সমান করিয়া লইবার আশা আর যেই করুক আমি ত করি না। হাজার বৎসরে কুলায় নাই, আর হাজার বৎসরে কুলাইবে না।

বলার কথাটা হলো, 'সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যে'র ধারণাটা আবুল মনসুর আহমদ বা তাঁর দলের কারও আবিষ্কার নয়; বরং হিন্দু সমাজে আগে থেকেই সব-অর্থে বিদ্যমান এবং কার্যকর একটা সর্বব্যাপী ধারণা। তার মানেই হলো, বুদ্ধদেব বসু 'বাংলা সাহিত্যের উদার প্রাঙ্গণ' বলে যে অঙ্গনে মুসলমান সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তা আসলে হয় মিথ্যা না হয় মায়া। আবুল মনসুর আহমদ এ ব্যাপারে গভীরভাবে সতর্ক ছিলেন বলেই নিকট-ইতিহাসের নজির টেনে ওই মায়ার স্বরূপ নির্দেশ করতে পেরেছেন।

চতুর্থত, বাংলাদেশের মূলধারার বয়ান ও তৎপরতায় 'স্বাতন্ত্র্যবাদ' বেশ নিন্দিত হলেও বিবরণীগুলো তৈরি হয় কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যাক, বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রায় যাবতীয় বয়ানের ভিত্তি বিশুদ্ধ স্বাতন্ত্র্যবাদ। অর্থাৎ বাংলাদেশের সাহিত্যকে যখন পশ্চিম বাংলার সাহিত্যধারা থেকে আলাদা করার দরকার হয় তখন তা স্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তিতেই করা হয়। এসব বিবরণী আবশ্যিকভাবে মুসলমানকেন্দ্রিক; পুরনো সাহিত্যিকদের মধ্যে কেবল মুসলমানরাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন; আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিবরণী প্রস্তুত হয় কলকাতার ইতিহাসের ঠিক বিপরীতে; মধ্যবিত্তের মনস্তাত্ত্বিক ও অপরাপর ইতিহাসও প্রণীত হয় আলাদা করে। এরপর সাধারণত লেখা হয় 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষাক্ত থাবায়', 'জিন্নাহর ষড়যন্ত্রে', 'সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে' ইত্যাদি। স্পষ্টতই এটা ইতিহাসের গোজামিল। প্রতিষ্ঠিত বর্গগুলোকে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের আওতায় না এনে অনুকরণমূলক অর্থে পাঠ করার কারণেই এরকম হয়। এই প্রবণতাই আসলে আবুল মনসুর আহমদের চিন্তাধারাকে মোকাবেলা না করে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে প্রধানত বাংলাদেশের বাইরে, এমনকি কলকাতায়, নতুন ইতিহাসগ্রন্থ প্রণীত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ইতিহাসের ওই স্পর্শকাতর এলাকার বর্গ বা পরিভাষাগুলো নতুন নানা অর্থ পাচ্ছে। আশা করা যায়, এতে আবুল মনসুর আহমদের 'স্বাতন্ত্র্যচেতনা' বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখার 'ভাষা' তৈরি হবে।

'সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য' প্রবন্ধে আবুল মনসুর আহমদ ভাষা সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন। স্বভাবতই। সাহিত্যের আলাপ ভাষা ছাড়া হতে পারে না। তিনি বলেছেন, 'আমাদের সাহিত্য আমাদের ভাষাতেই হইবে'। এই বাক্যে বর্ণিত 'আমাদের ভাষা' শব্দযুগলই আসলে আবুল মনসুর আহমদের ভাষাকেন্দ্রিক আলাপের মূলকথা। আবার তাঁর চিন্তার এই এলাকাটি যে বিপুলভাবে নিন্দিত হয়েছে, তার উৎসও ওই 'আমাদের ভাষা'। আমাদের বিবেচনায়, এই নিন্দায় পাকিস্তান আমলের স্মৃতি যতটা কার্যকর আছে, ভাষার ইতিহাস ততটা নাই। আবেগ যতটা আছে যুক্তি তার কানাকড়িও নাই। থাকলে নিন্দার সাথে একথাও প্রচারিত হত যে, বাংলা ভাষার প্রচলন, ভাষার সামগ্রিক ব্যবহার আর তত্ত্বায়নের ক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদ বাংলাদেশের খুব অগ্রবর্তী এবং চরিত্রবান চিন্তাবীর।

বিষয়টার জটিলতা ও ব্যাপকতা যথাসম্ভব কমিয়ে এনে বলা যায়, আবুল মনসুর আহমদ আসলে মুসলমান জনগোষ্ঠীর ভাষার সাহিত্যিক ব্যবহার চেয়েছেন। 'সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য' প্রবন্ধের ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর চাওয়াটা এরকম : 'বাঙলার পাড়াগাঁয়ে চারি কোটি মুসলমানের মুখে যে অফুরন্ত শব্দ-সম্পদ আছাড়িয়া মরিতেছে, সাহিত্যের মর্যাদায় যদি তারা বাঙলার অভিধানে স্থান পায় ...।' এ দাবি আসলে খুবই প্রাথমিক দাবি। মুসলমান লেখকদের মধ্যে এ দাবি পাকে-প্রকারে করেননি, এমন পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান চিন্তক-লেখক পাওয়া বস্তুত মুশকিল হবে। হিন্দু লেখকদের মধ্যে বিশদভাবে এ দাবি উত্থাপন করেছেন শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেনসহ আরও অনেকে। উনিশ শতকে লেখ্য বাংলার গড়ন-ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা না থাকায় এ দাবিকে বাড়তি কিছু বলে মনে হয়[৮]। অন্যদিক থেকে দেখলে, আবুল মনসুর আহমদের দাবি আসলে গভীরভাবে সাহিত্যিক দাবি। কারণ, মুসলমান সমাজের কথা যদি লিখতে হয়, তাহলে ওই শব্দাবলির ব্যবহার ছাড়া লেখা অসম্ভব। পরিহাস এই যে, বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা আসলে এই ভাষায় লিখেই কথাসাহিত্য করেছেন। ঝকঝকে আধুনিক ওয়ালীউল্লাহ্‌র কথাই ধরা যাক। তাঁর লেখায় আরবি-ফারসি-মুসলমানি-গ্রাম্য শব্দের যে পরিমাণ, আর ক্রিয়ারূপের যে ভিন্নতা-সাধন — আবুল মনসুর আহমদ বস্তুত তার বেশি কিছু চান নাই। শওকত ওসমান বা সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখায় যে পরিমাণ আরবি-ফারসি শব্দ আছে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে অপ্রচলিত বা আধা-প্রচলিত, আবুল মনসুর আহমদের লেখায় ততটা নাই। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যা এই, পাকিস্তান রাষ্ট্রতন্ত্র বাংলা ভাষা নিয়ে কিছু প্রকল্প নিয়েছিল। আবুল মনসুর আহমদ বা অন্য কারও কারও প্রস্তাবের সাথে সেগুলোকে মিলিয়ে পড়া যায়। কিন্তু এ দুটিকে গুলিয়ে ফেলা বুদ্ধিবৃত্তিক সততা নয়; তা অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির মধ্যেও পড়ে না।

আবুল মনসুর আহমদের ভাষা-প্রকল্পের দ্বিতীয় দিক পূর্ব বাংলার জন্য আলাদা প্রমিত বাংলার প্রস্তাব। ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভাষার ভিত্তিতে তিনি নতুন প্রমিত গড়ার প্রস্তাব দিয়েছেন, সে প্রস্তাব প্রচার করেছেন এবং নিজের লেখায় অংশত তার অনুসরণও করেছেন। কতটা আলাদা ভাষা তৈরি করতে চেয়েছেন তিনি? যতীন সরকার *জীবন-ক্ষুধা* উপন্যাস থেকে আবুল মনসুরের ভাষার কিছু নমুনা চয়ন করেছেন (যতীন, ২০১৫ : ৪৭) :

> ক) 'খবরের কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া ডাকে দরখাস্ত খেচিতে লাগে।'
> খ) 'বাড়ী শুদ্ধা লোক ... ।'
> গ) 'খুব নিপিস্ করিয়া নীল লাগাইয়াছে।'
> ঘ) 'দেখ্ শোন করিবার ভার ... '
> ঙ) 'ঐ সব দৃশ্য তার কলিজার কোণে কুটকুট করিতে থাকে।'
> চ) 'ত্রিশ মাইনের গরিব মাস্টারের এতদাতালি করা কি ঠিক হইয়াছে?'

এ উদাহরণগুলো থেকে মনে হয়, কোনো নিন্দনীয় কাজ সম্পর্কে আগাম সিদ্ধান্ত নিয়ে

না রাখলে ভাষাটা আঁতকে ওঠার মতো কিছু নয়। আবুল মনসুর নিজে বারবার তাঁর প্রস্তাবের কৈফিয়ত হিসেবে আমেরিকান ইংরেজির বরাত দিয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথেরও বরাত দিতে পারতেন। হ্যাঁ, কথাটা বিস্ময়কর শোনালেও সত্য, আবুল মনসুর আহমদ রাজধানীকেন্দ্রিক প্রমিতের যে প্রস্তাব দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাব তার সাথে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় (মোহাম্মদ আজম, ২০১৪)। তিনি জ্ঞাতসারে কাজটা করেছেন কিনা তা জানার অবশ্য বিশেষ উপায় নাই। আবুল মনসুর আহমদ এর বাইরে বর্ণমালা সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ প্রস্তাব অসংগত হয়ত, কিন্তু মোটেই নতুন কিছু নয়। কলকাতায় এ ধরনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল রীতিমতো অনেকবার। উত্থাপকদের মধ্যে পুরনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে হাল আমলের অধ্যাপক ক্ষেত্রগুপ্ত পর্যন্ত আছেন। অন্যদের প্রস্তাব অ-গৃহীত হয়েছে, আর আবুল মনসুরের প্রস্তাব হয়েছে নি-গৃহীত — বিবেচনার এই ধরনের মধ্যে নিশ্চয়ই সাধুতা বা ন্যায্যতা নাই।

৬ পরিশেষ

এ প্রবন্ধ থেকে যদি এমন ধারণা পাওয়া যায়, আবুল মনসুর আহমদের 'মত' সমর্থন করা এর লক্ষ্য, তাহলে নিঃসন্দেহে তা লিখনশৈলীর দুর্বলতা। রচনাটির ঘোষিত উদ্দেশ্য, যেমনটি প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, আবুল মনসুর আহমদ পাঠ। তাতে তাঁর চিন্তা ও তৎপরতাকে সূত্রবদ্ধ করার প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছিল; বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার বিদ্যমান ধারাপ্রবাহের সাথে মেলানোর চেষ্টা ছিল। আরও ভালো হয় বললে, চেষ্টাটা ছিল মূলত মূলধারার পাঠ-পদ্ধতিকে 'সমস্যায়িত' করা।

নিঃসন্দেহে আবুল মনসুর আহমদের মত ও মতাদর্শ বাংলাদেশে কর্তৃত্বকারী ধারায় পড়ে না। প্রশ্ন হলো, আমরা যখন কোনো অবদমিত চিন্তাধারা পড়ব, তখন তার পদ্ধতি কী হবে? কর্তৃত্বশীল ধ্যানধারণার ছকে বা মাপে পড়া নিশ্চয়ই যথার্থ পদ্ধতি নয়। কারণ, তাতে ইতিমধ্যে 'অপর' হয়ে থাকা চিন্তাধারার অধিকতর 'অপরায়ণ'ই কেবল নিশ্চিত হবে। এর সাথে যদি যুক্ত হয় ব্যবহৃত বর্গগুলোর স্থির-নির্দিষ্ট অর্থ আর বিশ্লেষণের বদলে যদি প্রাধান্য পায় মত ও মূল্য-আরোপ, তাহলে সংলাপ অসম্ভব হয়ে পড়বে। আবুল মনসুর আহমদ পাঠের ক্ষেত্রে এ দুই ঘটনা বেশ ভালোভাবেই ঘটেছে বলে মনে হয়। সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক আবুল মনসুর আহমদের সাথেও যে আমাদের যথার্থ সংলাপ রচিত হয়নি, তার কারণ, পর্যালোচনামূলক সন্দর্ভের বদলে আমরা মতের পক্ষ বা বিপক্ষের সন্ধান করেছি। বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান এই চিন্তকের সাথে কার্যকর সংলাপে লিপ্ত হতে পারা আমাদের জন্য লাভজনকই হবে।

টীকা

১. আবুল মনসুর আহমদ মনে করতেন, 'বাঙালি মুসলমানেরা বাঙালি হিন্দু ও অবাঙালি মুসলমান উভয়ের থেকে স্বতন্ত্র একটি জাতি' (আনিসুজ্জামান, ২০১৫ : ১৯২)। তাঁর সারাজীবনের

রাজনীতিচিন্তা এবং সাহিত্যচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ একাংশ গড়ে উঠেছে এ চিন্তার ভিত্তিতে।

২. আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্যচিন্তা প্রকাশিত হয়েছে প্রধানত তাঁর *বাংলাদেশের কালচার* (১৯৭৬) বইতে। এখানে তিনি সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে নতুনভাবে চিহ্নিত করেছেন এবং সংস্কৃতির ভিতের সাথে মিলিয়ে শিল্পকলার নির্মাণ, পাঠ ও উৎকর্ষ সম্পর্কে মৌলিক প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন।

৩. "'উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা' মাতৃভাষা ত্যাগ করেছে" বলতে আবুল মনসুর আহমদ উনিশ শতকে বাংলা ভাষার ব্যাপক-গভীর সংস্কৃতায়ন এবং তার ফলে মুখের ভাষা থেকে দূরত্ব তৈরি হওয়াকে বুঝিয়েছেন। 'বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা' কথাটা 'আধুনিক' বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কথা মনে করিয়ে দেয়। আবুল মনসুর এবং তাঁর সমকালীন মুসলমান লেখকেরা আসলে মুসলমান সমাজে প্রচলিত শব্দ ও বাগবিধির সাহিত্যিক ব্যবহার অবারিত করতে তৎপর ছিলেন। তবে তিনি নিজে না হলেও এ মতের অনুসারী অনেকেই অচলিত আরবি-ফারসি শব্দ আমদানি করে উনিশ শতকের প্রথমাংশের সংস্কৃত-বাংলার ['সংস্কৃত-বাংলা' কথাটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যবহার করতেন] মতোই অন্য ধরনের 'বিকট-বাংলা' রচনা করেছিলেন।

৪. সাটোরি আবুল মনসুর আহমদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এরকম সিদ্ধান্তই নিয়েছেন: 'Ahmad's insistence on the necessity of an *original, creative culture* specifically grounded in the ideals of Bengali-Muslim life was supposed to be the Muslim answer to 'the highly developed literature' that emerged 'from the literary men of the age from Vidyasagar and Bankimchandra to Rabindranath and Saratchandra'. (Sartori, 2007 : 126)

৫. শিখা গোষ্ঠীর লেখকদের রচনা, তৎপরতা ও অবদান সম্পর্কে এটি কোনো সামগ্রিক সিদ্ধান্ত নয়, একটি সাধারণ প্রবণতার শনাক্তি মাত্র।

৬. মোরশেদ শফিউল হাসান লিখেছেন : 'আবুল মনসুর আহমদ মনে করেন, 'কথা যত ভালোই হোক, কাজ তার চেয়েও ভালো'। আর 'প্রয়োজনের গতিবেগ কখনো ভাবাবেগের গতিবেগের সমান হতে পারে না'। *তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা সব সময় সেই বাস্তববাদী পথেই পরিচালিত হয়েছে*। (মোরশেদ, ২০১৫ : ১৬৮; বাঁকা হরফ সংযুক্ত)

৭. আনিসুজ্জামান লিখেছেন : 'এ-প্রসঙ্গে এ-কথা বলাও উচিত হবে যে, আবুল মনসুর আহমদ স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী হলেও সাম্প্রদায়িক ছিলেন না কখনো' (আনিসুজ্জামান, ২০১৫ : ১৯২)। এ মন্তব্যে 'স্বাতন্ত্র্যবাদী' ধারণাকে আবশ্যিকভাবে 'সাম্প্রদায়িক' ভাবা হয়েছে, যেখানে আবুল মনসুর আহমদ ব্যতিক্রম। কিন্তু বিপুল ব্যক্তির তথ্য-উপাত্ত এ ধারণাকে সমর্থন করে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যাক, অগ্রন্থিত গল্প ও চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ঘোষিতভাবেই স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ২০১৩); কিন্তু তাঁর সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ কখনো ওঠেনি।

যতীন সরকার লিখেছেন, '... রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে আবুল মনসুর অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী। ... [কিন্তু পরে] তাঁর অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনাও পরিবর্তিত হয়ে সম্প্রদায়কেই জাতি বলে গ্রহণ করে' (যতীন, ২০১৫ : ৪২)। এ ধরনের বিবরণী বহুল-প্রচলিত। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতি, পাকিস্তান, জিন্নাহ, মুসলিম লিগ, কংগ্রেস ইত্যাদি নিয়ে রচিত একরাশ বিশ্বনন্দিত অ্যাকাডেমিক সন্দর্ভ থেকে নিশ্চিত করে বলা যায়, ওই কালের রাজনীতি সম্পর্কে 'সাম্প্রদায়িকতা', 'অসাম্প্রদায়িক' ইত্যাদি শব্দের অনুরূপ ব্যবহার শুধু খুব সরলই নয়, বাস্তবতার আড়ালকারীও বটে।

৮. বিস্তারিত দেখতে আগ্রহীদের জন্য দ্রষ্টব্য : *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*, মোহাম্মদ

আজম, আদর্শ, ঢাকা, ২০১৪।

সহায়কপঞ্জি

আনিসুজ্জামান, ২০১৫। 'আবুল মনসুর আহমদের রাষ্ট্রচিন্তা : একটি রূপরেখা', *আবুল মনসুর আহমদ স্মারকগ্রন্থ*, ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত, প্রথমা, ঢাকা।

আবুল মনসুর আহমদ, ১৩৪৯। 'সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য', *মাসিক মোহাম্মদী*, মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত, ষোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, কলকাতা।

আবুল মনসুর আহমদ, ১৯৯৫। 'পাক-বাংলার রেনেসাঁ', *বাংলাদেশের কালচার*, চতুর্থ সংস্করণ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

ইমরান মাহফুজ (সম্পা.), ২০১৫। *আবুল মনসুর আহমদ স্মারকগ্রন্থ*, প্রথমা, ঢাকা।

জয়া চ্যাটার্জী, ২০০৩। *বাঙলা ভাগ হল*, আবু জাফর অনূদিত, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

বুদ্ধদেব বসু, ২০০৭। 'সাহিত্যে পাকিস্তান অসম্ভব', *পূর্ব বাঙলার ভাষা*, এবাদুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ঢাকা।

মোরশেদ শফিউল হাসান, ২০১৫। 'আবুল মনসুর আহমদ : গণতন্ত্র-ভাবনা', *আবুল মনসুর আহমদ স্মারকগ্রন্থ*, ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত, প্রথমা, ঢাকা।

মোহাম্মদ আজম, ২০১৪। 'প্রমিত বা মান বাংলা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা', *বাংলাদেশের হৃদয় হতে*, সম্পাদক : সন্‌জীদা খাতুন, ছায়ানট, ঢাকা।

যতীন সরকার, ২০১৫। 'আবুল মনসুরের জীবনদর্শন : *জীবন-ক্ষুধার* দর্পণে', *আবুল মনসুর আহমদ স্মারকগ্রন্থ*, ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত, প্রথমা, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ২০১৫। 'যেখানে আবুল মনসুর আহমদ স্বতন্ত্র', *আবুল মনসুর আহমদ স্মারকগ্রন্থ*, ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত, প্রথমা, ঢাকা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৩। *অগ্রন্থিত রচনা*, সম্পাদনা : সাজ্জাদ শরিফ, প্রথমা, ঢাকা।

Chakrabarty, Dipesh, 2002. 'Memories of Displacement : The Poetry and Prejudice of Dwelling', in *Habitations of Modernity : Essays in the Wake of Subaltern Studies*, The University of Chicago Press, Chicago.

Kaviraj, Sudipta, 2003. 'The Two Histories of Literary Culture in Bengal', in *Literary Cultures in History : Reconstructions from South Asia*, Edited by Sheldon Pollock, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London.

Sartori, Andrew, 2007. 'Abul Mansur Ahmad and the Cultural Politics of Bengali Pakistanism', in *From The Colonial To The Postcolonial: India And Pakistan In Transition*, Edited by : Dipesh Chakrabarty, Rochona Majumdar and Andrew Sartori, Oxford University Press, New Delhi.